১০ নং মিন্টো লেন

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

১০নং মিন্টো লেন কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের গোছার মতো। হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেও হঠাৎ কখন জায়গা মতন নেমে আসবে। ভুরু ঠেলে ওপরে চাইবার প্রয়োজন নেই, কপালই জানান দেয় সেখানে চুল পড়েছে।

১০নং মিন্টো লেন গলির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচতলার এক পুরোনো, লাল ইটের ম্যানশন। কয়েক যুগ ধরে এজমালি সম্পত্তি। পাঁচতলা জুড়ে পনেরোটা ফ্ল্যাটেই ভাড়া বসানো। কিন্তু কে কাকে ভাড়া দেয় কেউ জানে না, ভাড়াটেরাই জানে না পাশের ফ্ল্যাটের মালিকানা কার। তাদের অনেকেরই মনে নেই শেষ কবে ভাড়া গুনছে।

১০নং মিন্টো লেনের পাঁচ তলার ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দাটাই কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের গোছার মতো। ওই বারান্দার পাশে আরও যে কতকগুলো একই চেহারার বারান্দা আছে, তার নীচে যে আরও চার-চারটে তলা আছে তা চোখে ধরা দেয় না।

১০ নং মিন্টো লেনের সমস্ত সত্তা মুছে গিয়ে একটা ছোট্ট, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দা হয়ে আছে। সাত-সাতটা বছর।

যবে থেকে ডিকির বউ হয়ে এসে দুপুরে, সন্ধেয় বারান্দায় এসে দাঁড়ানো শুরু করল শীলা। লাল কিংবা পুঁতে শাড়িতে জড়ানো এক ঝলক সূর্যরশ্মিই যেন। কখনো পান কখনো লিপস্টিকে এমন লাল ঠোঁট যেন স্টেজে দাঁড়ানো নায়িকা। একরত্তি গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দার স্টেজে দাঁড়ানো নায়িকা।

আর পাড়ার সমস্ত উঠতি যুবক যার দর্শক, যার ফ্যান। গত সাত-সাতটা বছর নীতিন গলির রাস্তাটুকু হেঁটে পার করতে পারেনি একবার অন্তত ওই কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের মতো ওই বারান্দার দিকে এক ঝলক না তাকিয়ে। রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে কতবারই না মনে হয়েছে পাড়ায় আর একটিও বাড়ি, একটিও দরজা, একটিও জানলা নেই। আছে শুধু একটা বারান্দা, আর তার ওপর একটা থির বিজুরি রক্তমাংসে বাঁধা।

সাত বছর আগে স্কুলে যাওয়ার পথে নীতিন প্রথম দেখে দৃশ্যটা। হয়তো সেদিন পরীক্ষা ছিল, তাই বেশ হড়বড়িয়েই হাঁটছিল নীতিন ট্রামরাস্তার দিকে। খান তিনেক ফাউন্টেন পেনের ভারে বাঁ দিকের বুক পকেট হেলে পড়েছে, ডান হাতে খান চারেক মোটাসোটা বই। একটা মুখস্থ করা উত্তরের শুরুর বাক্যটাই হয়তো মনে মনে রগড়াচ্ছিল, ফলে চোখ ছিল চিন্তার ভারে মাটির দিকেই। যখন কোত্থেকে এক ফোঁটা জল এসে পড়ল চশমার কাঁচে।

কাচের ওপর ঝাপসা ফোঁটাটা যে জল তা প্রথমে বুঝতেই পারেনি নীতিন। ও দেখল বাঁ চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। নাকি ডান চোখের? না দু-চোখেরই? ও কী হয়েছে বুঝতে মাটির থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে

চাইল। অমনি আরও কয়েকটা ফোঁটা হাওয়ায় উড়ে এসে চশমার দুই কাচে পড়ল। আর তখন নীতিনের প্রথম খেয়াল হল যে আকাশে মেঘ করেছে, নীলচে অন্ধকার একটা ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশে, বেশ জোরে হাওয়া বইছে আর বৃষ্টির উড়ো ফোঁটাও ঝরছে এখানে ওখানে।

আর ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে ঝাপসা চশমা দিয়েই নীতিন দেখে ফেলল ১০নং মিন্টো লেনের ছোট্ট, গোল বারান্দায় লাল শাড়ি বিদ্যুৎটিকে।

পাড়ার সব ছেলের মতো নীতিনেরও হিসেব আছে পাড়ার কোন বাড়ির কোন বারান্দায় কোন মেয়ে দাঁড়ায়। আর সকলের মতো নীতিনেরও ছকা আছে কোন বারান্দায় কার দাঁড়াবার সময়টা কী। ১০নং মিন্টো লেনের ওই বারান্দায় কোনো মেয়ে দাঁড়ায়নি কোনো দিন। ওটা মস্তান ডিকি গোমেসের বারান্দা, যেখান থেকে ক্কচিৎ কখনো মাঝরাত্তিরে মাতালের হুঙ্কার শোনা যায়। কখনো সখনো মাতালদের কোরাস গান। যখন সারাপাড়া টের পায় জাহাজের মসালচি ডিকি গোমেস মোটা কামিয়ে মাস দুয়েকের মতন ডাঙার বাসিন্দা হল।

নীতিন ভাবল, মেয়েটি কি তাহলে ডিকিদার বউ? ভেবেই চমকে উঠল ভেতরে ভেতরে। ডিকিদা ডাঙায় থাকে গড়ে চার মাস, যার দু-মাস যায় পার্টি করে, ফুর্তি করে, পয়সা উড়িয়ে। বাকি দু-মাস যত্রতত্র ধারকর্জ করে। দু-মাস স্যুট-বুটে দুরন্ত ভাবে, দু-মাস নোংরা আকাচা জামায় মদো মাতাল চেহারায়। দু-মাস ডিকি মস্তান পাড়া শাসন করে, উঠতি রুস্তমদের চড় চাপটা টিকটাক মেরে শিব করে রেখে, অন্য দু-মাস ওদেরই পয়সায় বাংলা চোলাই, কাঁচি ক্যাপস্টান খেয়ে। গলাগলি করে রোয়াকে বসে।

ধুর! ও লোকের ও বউ হয় না নিজের মনে জোরে জোরে বলতে বলতে নীতিন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েও ফের তাকাল পাঁচতলার ওই বারান্দার দিকে। রক্তমাংসে বাঁধা, বিদ্যুৎটিও কখন জানি গোল বারান্দার গোল রেলিঙ ধরে ঘুরে গেছে ট্রামরাস্তার দিকে। আর, ঝাপসা কাচেও নীতিন আবছাভাবে দেখল শাড়ি জড়ানো বিদ্যুৎ নীচে তাকিয়ে ওর দিকেই।

এরপর হয় বৃষ্টির আশঙ্কায় নয়তো জীবনের প্রথম এরকম সঙ্কোচে নীতিন প্রায় দৌড়তে থাকল ট্রামের জন্য।

সন্ধ্যেবেলায় পাড়ার রোয়াকে বসতেই ভুল শুধরে গেল নীতিনের। লাল-শাড়ি বিদ্যুৎ বাস্তবিকই ডিকির নবপরিণীতা স্ত্রী। মাইরি!' বলে আঁতকে উঠেছিল নীতিন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কিছুটা নিশ্চিন্তও হয়েছিল। মহিলাকে তাহলে মাঝেমধ্যেই আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখা যাবে। পাড়ার একটা প্রকৃত কালেকশান হল তাহলে।

পরদিন স্কুলের পথে ফের ওপরে তাকাল নীতিন। কিন্তু বারান্দা খালি। যাচ্চলে! এর কি বারান্দায় দাঁড়ানোর কোনো নিয়মকানুন নেই? কিছুটা পথ পেরিয়ে ফের মাথা ঘোরাল নীতিন। শুধু থমথমে মেঘ দেখল আকাশে; আকাশে বা বারান্দায় কোথাও কোনো বিদ্যুৎ নেই।

সাত-সাতটা বছর কিন্তু খুব কম সময় না—ভাবল নীতিন। এর মধ্যে চার চারটে বছর ডাক্তারি পড়া হয়েছে। নারী ও পুরুষের অ্যানাটমি সম্পর্কে কত জ্ঞান বেড়েছে নীতিনের। সহপাঠিনী কুমকুমের ঠোঁটের চুম্বন পেয়েছে, শরীরের ঘ্রাণ পেয়েছে, স্পর্শ করেছে ওর নরম, সাদা ত্বক। চোখের সামনে দেখেছে ডিকি জাহাজের ডিউটিতে জয়েন করে বন্ধু সুবিমল, কাতু, রঞ্জিত, সুজয়, টমি, অ্যান্থনি, রবিন নিয়মিত যাতায়াত করছে পাঁচতলার ওই

রোমাঞ্চকর ফ্ল্যাটে। হয়তো রবিন প্রথম বলেছিল চারমিনার ধরিয়ে ইডেনের ঘাসে শুয়ে, অসাধারণ মেয়েছেলে রে! তুলনা হয় না। একেবারেই পার্ফেক্ট নিমফোমেনিয়াক।

কড়াৎ করে বাজের মতো কথাটা এসে বুক আছড়ে শিরা, রক্তনালী ফুড়ে পেটের মধ্যিখানে কোথাও এসে দাপাতে লাগল। নীতিন বুঝল ওর পেটের মাঝখানটা লাফাচ্ছে। ভয়ে, লজ্জায়, সম্পূর্ণ হতাশায়। ওর গলার আওয়াজ ধরে গেল। ও বলতে চাইল 'সত্যি? কিন্তু গলা ভেঙে গেল। মেয়েটা নয়, ওর ঘৃণা হল রবিনের প্রতি। কাঁপা কাঁপা হাতে চারমিনার ধরাতে গিয়ে চোখে একটু যেন ঝাপসাই দেখল। আকাশের দিকে মুখ তুলে বুঝতে গেল কাচে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল কি না। কিন্তু কোথাও বৃষ্টির চিহ্নই দেখল না।

এরপর কোনো একদিন হয়তো অ্যান্থনি বলেছিল, কিংবা সুবিমল, কিংবা সুজয়, কিংবা...কী এসে যায় কে সেটা? কিন্তু কেউ একজন ছবি বর্ণনা করার মতো করে বর্ণনা করেছিল শীলার শরীর। সোনালি তামাকের রঙের টানটান চাবুক শরীর। কিছুটা রোমশও, আবার তা সত্ত্বেও মসৃণ। বড়ো উষ্ণ শরীরও, একটা পর্যায়ে নদীর মতো ঘামে। তখন চোখ দুটো এত বড়ো হয় যেন মানুষের চোখের কোটরে বাঘিনির আইবল। তখন কপালের টিপটাও যেন শুক্ল পক্ষের চাঁদের মতো ফড়ফড় করে বাড়তে থাকে। আর বুকের...

নীতিন আর শুনে উঠতে পারেনি বাকিটুকু। হঠাৎ বাথরুম করতে যাওয়ার বাহানায় উঠে গেছে। তারপর পাড়ার বারোয়ারি টয়লেট ফণীদার গ্যারেজের পাশের দেওয়ালের সামনে অকারণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল এইমাত্র শোনা কথাগুলোর মানে নিয়ে। আসলে নিজের মনে দেখতে লাগল সোনালি তামাকের রঙের শরীরটাকে। যার সঙ্গে ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দায় দাঁড়ানো শরীরটাকে মেলানো বেশ কঠিন। একই শরীর, অথচ

পরিবেশ ও স্থানবিশেষে কত আলাদা। বহুক্ষণ এভাবে দেয়ালমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে শেষে বাড়ি চলে গেল নীতিন।

আর সে-রাতেই প্রথম আধা ঘুম, আধা জাগরণে শীলাকে দেখল নীতিন। ওর মনে হল ওর বন্ধুরা শুধু ডিকি গোমেসকেই নয়, ওকেও ঠকিয়েছে। এক মূখের পায়ের তলায় তো হামেশাই কোনো জমি নেই, শুধু জল; আরেক মূর্খের মাথার ওপর কোনো ছাদ নেই, মেঘ নেই, আকাশ নেই, শুধু একটা বারান্দা।

মেডিক্যালের ছাত্র হবার প্রথম দিনগুলোর উত্তেজনায় বন্ধুদের মনে মনে ক্ষমা করে দিল নীতিন। ওর তখন বেশ কিছু সহপাঠিনী। কারো শাড়ি। কারো সালোয়ার-কামিজ, কারো লং স্কার্ট ওর ভালো লাগে; কারো হাসি, কারো রাগী, গোমড়া মুখ, কারো ফ্যালফেলে চাউনি ওর চোখ টানে। কিন্তু সন্ধ্যেকালে রোয়াকে বসে ওর শোনা চাই রবিন নয়তো সুজয় নয়তো টমির মুখে শীলার কথা, শীলার বর্ণনা। কোনোদিন দুপুরে কাকে ভুনা কারি বেঁধে খাইয়েছে, কাকে পর্ক ভিন্দালু খাওয়ানোর কথা দিয়েছে। কাকে চুরি করে খাইয়েছে ডিকির আনা স্কচের বোতল থেকে এক পেগ জনি ওয়াকার। এরা সবাই এখন ডিকির ন্যাওটা। মস্তান ডিকি এখন ঘুষোঘুষি কমিয়ে পাড়ার এইসব কলেজ-করা ছেলেদের সঙ্গে সময় কাটায়। জাহাজ থেকে ফিরে পার্টি জমায় এদের সঙ্গে। মাল টেনে বারোদুয়ারিতে বেহুশ হয়ে পড়লে এরাই কাঁধে করে তুলে দিয়ে যায় পাঁচতলার আস্তানায়। টানটান করে শুইয়ে দেয় বিছানায়। তখন চোখবোজা ডিকি টিপিকাল সাহেবি অ্যাকসেন্টে বলে দেয়, থ্যাংক ইউ ব্রাদার, থ্যাংক ইউ।

নীতিন বুঝেছিল জাহাজি ডিকির পক্ষে শীলার ওপর বারোমাসি দখল রাখা অসম্ভব। ডিকি নিজেও জানত যে ও আসলে একজন পার্টটাইম স্বামী। খোলসা করে বলতে গেলে—একজন সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান পার্টটাইম স্বামী।

এই ডিকিদা কাল বলতে গেলে জোর করে নীতিনকে টেনে নিয়ে এসেছিল ওর রোমাঞ্চকর ফ্ল্যাটে। সদ্য জাপান ট্যুর করে ফিরেছে জাহাজ। ডিকিদা-র পকেট ভরতি লাকি স্ট্রাইক সিগারেট। গায়ের র্যাংলার জ্যাকেটে উগ্র সেন্টের গন্ধ। মুখে হুইস্কির সোঁদা ঘ্রাণ। বোঝাই যায় ট্রিপের টাকা এখন উথলে উঠছে পকেটে। তবু শেষ বারের মতো মিনতি করল নীতিন, ডিকিদা, থাক না! আরেক দিন হবে এখন।

হাত ছাড়েনি ডিকি। কবজিতে এখনও দেদার জোর। চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, আর কবে হবে নীতু? দেখছ না কত পাক ধরেছে চুলে? দাড়িও পেকেছে। একদিনও তো বউদির সঙ্গে দেখা করতে এলে না। জানি ডাক্তার হচ্ছ শিগগির, তা বলে মুখ দাদাদের ভুলে যাবে? তোমাকে লাটাই ধরে ঘুড়ি ওড়াতে শিখিয়েছিল কে?

হে ভগবান, তাই তো! নীতিনের মনে পড়ল কবেকার সেই দিলগুলো। লাহাদের বড়ো ছাদে লাটাই ধরে ঘুড়ি ওড়ানোর হাতেখড়ি হয়েছিল এই ডিকিদা-র কাছেই। তখন চশমা হয়নি নীতিনের, কাচে জল লাগার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ঘুড়ি উড়িয়ে একাগ্র চিত্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাসেরও শুরু সেই। তার অনেক দিন পরে একবার চশমায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে ওপরে চেয়ে এক নতুন খেলা শিখল নীতিন। গত সাত বছরে ফলে আর বিশেষ একটা বারান্দার দিকে নজর না তুলে ওর কিছুতেই মিন্টো লেন পার হওয়া হয় না।

সেই থেকে কপালের ওপর এক গোছা চুলের মতো ঝুলে আছে একটা বারান্দা।

নীতিন ডিকির পিছন পিছন উঠে গিয়েছিল ১০নং মিন্টো লেনের পাঁচতলার ওই ফ্ল্যাটে।

গতকাল খুব দূরের ঘটনা-নীতিন ভাবল মনে মনে। খুব স্কচ খাইয়েছিল, ‘ডিকিদা, কিন্তু সন্ধেটা মন থেকে মুছে যায়নি। ওর গেলাসে মদ দিতে দিতে বলেছিল ডিকি, দিস ইজ জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল, নট রেড। এর জাতই আলাদা। মদে ঢোক দিতে দিতে এক নজরে নীতিন দেখছিল শীলাকে। কে বলবে সাত-সাতটা বছর কেটে গেছে এর মধ্যে। তিন তিনটে মিস ক্যারেজ হয়েছে। ফলে মহিলা এখনও মা হননি। তার বেদনা কি কোথাও বাসা বেঁধেছে মুখে? নীতিনের ডাক্তারি চোখ কিছুই খুঁজে পেল না।

হঠাৎ নীতিনের প্লেটে কাবাব ঢালতে ঢালতে ডিকি বলল, জানো নীতু, আজ আমার বউয়ের জন্মদিন। শি ইজ থার্টি টুডে। কিন্তু আমি শালা তোমার বন্ধুদের কাউকে ইনভাইট করিনি। ওরা সবাই বিট্রেয়ার। কেউ আমার পাশে দাঁড়ায়নি কখনো। শুধু পার্টি করতে এসেছে। যখন আমি মোটা মোটা ক্যাশ নিয়ে এসেছি। যখন ফের জাহাজে গেছি সব সুখের পায়রা উড়ে গেছে যার যেখানে খুশি। তোমার বউদির কোনো সুবিধে-অসুবিধে কেউ আসেনি দেখতে। শালা...

এক-একটা কাবাবের টুকরো গোটা গোটাই সেঁধিয়ে যাচ্ছিল নীতিনের কন্ঠনালীতে। ডিকিদা-র অনুপস্থিতিতে কেউ আসেনি মানে? তখনই তো আসল মোচ্ছব চলত এ বাড়িতে। নীতিন প্লেট থেকে চোখ তুলে চাইল শীলার দিকে। দেখল শীলাও সেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছে ওকে। ওর যে দৃষ্টি প্রথম দেখেছিল সাত বছর আগের মেঘলা সকালে।

শীলার হাতে স্কচের গেলাস। কিন্তু আসল মদটা ওর চোখে। নীতিন চোখ নামিয়ে নিল। ডিকি ফের ওর গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলল, তুমি বড় স্লো যাচ্ছ ব্রাদার, কুইক! কুইক! শীলার জন্মদিন আজ, আজ বটমজ আপ হতেই হবে।

বটমজ আপই হল। কিন্তু মেঝেতেই ফ্ল্যাট হয়ে পড়ল ডিকি। বোতলের সত্তর ভাগ একাই ধ্বংস করার সাক্ষাৎ প্রতিফল। ওকে ধরাধরি করে বিছানায় নিয়ে ফেলল শীলা আর নীতিন। স্বামীকে শোয়ানোর পর কী ভেবেই যেন ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারন্দাটায় গিয়ে দাঁড়াল শীলা। বোধ হয় রাতের আকাশের তারা দেখতে।

একটু পর ওর পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াল নীতিন। শুনল ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বলছে শীলা, কাল দুপুরে একবারটি আসবে এখানে? অসুবিধে হবে?

অনেক দিন পর ফের গলা ভেঙে গেল নীতিনের ছোট্টো বাক্যটা বলতে, না, না, আসব। কোনো অসুবিধে নেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সাতটা বছরকে মাত্র সাতটা দিনের মতো ধরে ফেলতে পারছে নীতিন। আবার সবই কীরকম ফসকে ফসকেও যাচ্ছে। আসল বস্তুটি যত কাছে আসছে। স্মৃতিগুলো চশমার কাচে বৃষ্টির ফোঁটার মতো হয়ে পড়ছে। নীতিন কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে গেল। নিশ্চয়ই ওর আসার ওপর বারান্দা থেকে নজর রেখেছে শীলা। হে ভগবান, শেষে এই দিনটাতেই ও চোখ তুলে এই কপালের ওপর চুলের গোছার মতো ঝুলে থাকা বারান্দাটাকে দেখতে ভুলে গেল!

শীলার পরনে কি সেই প্রথম দিনের লাল শাড়ি? অতশত বুঝতে পারল না নীতিন। শাড়ি নিয়ে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। শীলা বলল, সকালে মাথাটাথা ধরেনি তো?

নীতিন লজ্জায় হেসে ফেলল, না ওরকম আমার হয়টয় না।

শীলা সম্ভবত ঠাট্টার ছলেই বলল, কী হয়টয় তোমার?

বেশ ঝাঁঝের মাথায় নীতিন উত্তর করল, আমার কিছুই হয় না।

সবজান্তা ভাব করে শীলা বলল, তা আমি জানি। সাত সাতটা বছর দেখছি তো!

–তার মানে? তুমি আবার কী দেখলে?

—কেন রাস্তা থেকে চোখ তুলে তুমিই শুধু দেখো। বারান্দা থেকে নীচে চেয়ে আমি কিছু দেখতে পাই না বুঝি?

-ও তাই! তা কী দেখতে পাও?

–গুমোর! বাবুর গুমোর।

গুমোর! নীতিন আকাশপাতাল হাতড়ে হদিশ পেল না ওর কোথায় কী গুমোর। কেনই বা! শীলার সঙ্গে ওর কী টক্কর। ও আস্তে আস্তে গিয়ে বসল একটা মচমচে বেতের সোফায়। আর বলল, তাহলে ডেকে এনে কেন একথা বলোনি আগে?

ফোঁস করে উঠল সেই আদি অকৃত্রিম খির বিজুরি, কী বলিনি?

রবিন, সুজয়, টমি তোমায় বলেনি আমি ডেকেছি?

মাথায় ওই গোল বারন্দাটাই ভেঙে পড়েছে বোধ হয় নীতিনের। এতজনকে ডেকে খবর দিয়েছে, কিন্তু হারামিরা কেউ একথা জানায়নি ওকে! এত নীচ ওই তথাকথিত ভদ্রলোকের ছেলেগুলো? ওর তথাকথিত বন্ধুগুলো?

কিন্তু মুখ দিয়ে নীতিনের বেরুল, হ্যাঁ, তা বলেছিল। পরাস্ত কণ্ঠে শীলা বলল, তাই না শেষে দাদাকে দিয়ে পাকড়াও করে আনতে হল।

একটা হালকা রোমাঞ্চ বোধ করল নীতিন। ভেতরে ভেতরে কৃতজ্ঞ বোধ করল বন্ধুদের প্রতি। নাই বা খবর দিয়েছে। না হলে এভাবে, এই সমাদরে হয়তো আসা হত না সোনালি তামাকের রঙের ... নীতিন মনে মনে শীলার গোটা শরীরটা দেখতে শুরু করেছে। তোক না পরের বর্ণনায় জানা, কল্পনাটা তো নিজের। চাইলেই তো এখন মিলিয়ে দেখা যায় বাস্তব আর কল্পনাকে। নীতিন বেতের সোফা ছেড়ে উঠে এসে বসল শীলার পাশে খাটে। হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরল। উহ কী উষ্ণ হাত। একটা মৃদু চাপ দিল হাতে। চাপটা ফিরিয়ে দিতে শীলা বলল, তুমি তো ডাক্তার। একটা উপকার করবে?

—কী উপকার বল?

—ক-টা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাবে এসে এসে ক-দিন?

-ইঞ্জেকশন! কেন? কী হয়েছে শীলার? প্রশ্ন তো নয়, কতকগুলো চাপা উৎকন্ঠা। যা মুখ গলে বেরোয় না।

শীলাই ফের বলল, তোমার দাদাই ধরে আনে রোগটা বাইরে থেকে। আর আমায় দেয়। এই নিয়ে তিনবার হল। আমার আর ডাক্তারের কাছে যাবার মুখ নেই গো। গতবারই ওয়ার্নিং দিয়েছে এভাবে চললে বিশ্রী কিছু ঘটে যেতে পারে। কিন্তু ফের ধরেছে, লজ্জার কথা আমি কাকে বলব বল তো?

নীতিন শীলার হাত থেকে হাত তুলে নিয়ে খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কেন বলেছ তো একজনকে অন্তত। আমি কাল ওষুধ আর সিরিঞ্জ এনে

ইঞ্জেকশন দিয়ে যাব তোমাকে। তবে তোমার আগের প্রেসক্রিপশনটা পেলে ভালো হয়।

শীলা বলল, আছে! এই নাও। বলে ব্লাউজে হাত গলিয়ে বুকের ভেতর থেকে বার করে আনল একটা দলা পাকানো কাগজ। নীতিন বুঝল রবিন হোক সুজয় হোক টমি হোক বা সুবিমল ভুল বলেনি। যদিও কোনো প্রমাণ নেই যে তারা বানিয়েও বলেনি। সুডৌল কুমারী স্তন শীলার, সোনালি তামাক রঙের ত্বকও কুমারীর মতো অবয়সি, আপন উষ্ণতায় ও স্বেদে ভিজিয়ে ফেলেছে কাগজের টুকরোটাকে।